ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1063-1070
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.323

পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা

ভবেশ চন্দ্র মুর্মু, *গবেষক, সাঁওতালি বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 09.03.2026; Accepted: 13.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The ancient or primitive inhabitants of the tribal people have a tradition of living together in an organized manner, keeping their language, culture and traditions alive, from that time to the present. This process of organizing or living together is different in different ethnic groups of the tribal people. The tribal people choose the places or places where they consider suitable for living; where there is abundance of water. There is flat land suitable for cultivation. There are delicious fruits and root forests to satisfy their hunger. There is no fear of any obstacle or danger to spend their lives. They choose such places. They live permanently in that place. If they do not face any obstacle or danger, they do not shift their residence. The tribal people belong to different castes or communities. They live by establishing different caste-based rural environments by identifying their own ethnic identity. The importance and contribution of the knowledge and epistemology of the tribal ancestors in creating this rural environment is immense. They have created or established village management systems or rules by creating each village. This is an incomparable contribution among the tribals. In this research paper, I have tried to present the theory of knowledge through research only on the village organization system of the tribals of West Bengal. Where what kind of customs, rules and management are there in the village organization system of the tribals of West Bengal? If any problem arises in the daily life of the tribals through that management, by what process do they solve that problem? What is the condition of this village organization system in the present generation and what kind of evidence is being reflected? The main aim and objective of this research paper is to explore and present the answers to such research questions.

Keywords: Identity of the tribal people of West Bengal, village structure, village organization system, village governance, nature of current village organization

আমার এই গবেষণার বিষয় ‘পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা’ দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছি। এ বিষয়ে আদিবাসী পূর্বপুরুষদের যে জ্ঞানতত্ত (Epistemoogy) প্রতিফলিত হয়েছে গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা সম্পর্কে; তা কিন্তু অতুলনীয়। আদিবাসীরা কিরকম স্থানে গ্রাম স্থাপন করেন এবং গ্রাম কিভাবে পরিচালনা করলে, ঐ গ্রামের মানুষজন তাদের যে সংস্কৃতি চেতনা গুলো রয়েছে; তা নিখুঁত ভাবে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হবে। এই যে জ্ঞানতত্ত আদিবাসী পূর্বপুরুষ তৈরী করে গেছেন, তা কিন্তু পুঁথিগত শিক্ষাহীন মেরুদন্ডে মহামূল্য জ্ঞান আবিষ্কার। জাতিসত্তাকে বাঁচিয়ে রাখার মহান এই কার্য ও কৌশল বেঁধে দিয়ে গেছেন। জাতিভিত্তিক মানুষকে

বেঁচে থাকতে হলে সংস্কৃতির আধারে যে নিয়মাবলী রয়েছে, তা মেনে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমি এখানে পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের মধ্যে নয়টা (৯) জাতি বা সম্প্রদায় এর গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থার বিভিন্ন জ্ঞান উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি। তথ্য সংগ্রহের কৌশল হিসাবে আদিবাসী সমাজ সম্পর্কে বিভিন্ন মূল্যবান গ্রন্থ থেকে জ্ঞান নেওয়া হয়েছে। সেই জ্ঞান ভান্ডার থেকে গ্রাম সংগঠন বিষয়ে বিভিন্ন মূল্যবান যে ব্যবস্থা গুলো রয়েছে তা বিশ্লেষণ করে, বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় মনে করে এই বিষয় গবেষণা করেছি।

পুরো বিশ্ব জুড়ে আদিবাসীরা তাদের অমুল্য সম্পদ ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রেখে বসবাস করে চলেছেন। বর্তমানে পুরো বিশ্বে উইকিপিডিয়া এর তথ্য অনুযায়ী ৪৭৬ মিলিয়ন আদিবাসী রয়েছেন। কারা এই আদিবাসী? আদিবাসী বলতে কাদেরকে বোঝায়? এ বিষয়ে ডঃ রিভার্স বলেছেন–

> "তারা সমাজের এমন একটি গোষ্ঠী যাদের জীবনে জটিলতা নেই, যারা এখনও একই ভাষা বলে মনের ভাব প্রকাশ করে, যাদের আকৃতি বা সংস্কৃতিগত সাদৃশ্য আছে, নিজেদের নিয়ম-কানুন রক্ষার জন্য যাদের পঞ্চায়েত আছে এবং প্রয়োজন হলে যারা গোষ্ঠী সচেতন মনোবৃত্তি নিয়ে যুদ্ধবিগ্রহ বা সংগ্রাম করে থাকে।"[১]

আবার এ বিষয়ে পিডিংটন এর উক্তি–

> "তারা এমন এক গোষ্ঠীর মানুষ যারা একই ভাষায় কথা বলে, একই অঞ্চলে বসবাস করে এবং যাদের সাংস্কৃতিক জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য (Homogenity) বিদ্যমান।"[২]

অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার আদিবাসী সম্পর্কে বলেছেন–

> "আদিবাসী সমাজ হল কয়েকটি পরিবারের সমষ্টি অথবা এক গোষ্ঠীর পরিবার, যাদের নামের সমতা থাকে, সদস্যরা একটি নির্দিস্ট অঞ্চলে বসবাস করে, একই ভাষায় কথা বলে এবং একই রুপ বিবাহভিত্তিক ও পেশাভিত্তিক ধর্মীয় বাধা নিষেধ মেনে চলে এবং নিজেদের মধ্যে বাধ্যবাধকতা, সামঞ্জস্য ও আদান-প্রদান করে থাকে।"[৩]

এই মহান ব্যক্তিদের উক্তি দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, আদিবাসী বলতে তাদেরকে বলা হয় যদের ভাষা একই রকম, একেক রকম সংস্কৃতি মেনে চলে এবং একেকটা অঞ্চলে সহজ, সরল ভাবে জীবন যাপন করে থাকে। আদিবাসীরা নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক।

আদিবাসীরা নিজস্ব গ্রাম্য পরিবেশ গঠন করে বসবাস করে থাকেন। একত্রে একটা নির্দিষ্ট গ্রামে বসবাস করার উদ্দেশ্যে ঐ গ্রাম পরিচালনার জন্য কয়েকজন ব্যক্তির দায়িত্ব ও অবদান রয়েছে। যেটা গ্রাম সংগঠন নামে পরিচিত। আদিবাসীদের মধ্যে এই গ্রাম সংগঠন প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয়েছে, সেই আদিমকাল হতে পূর্বপুরুষের হাত ধরে। আমি এখানে পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের মধ্যে নয়টা (৯) জাতি বা সপ্রদায়ের গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে তাদের জ্ঞানকে তুলে ধরছি। সেই জাতি বা সম্প্রদায় গুলো হল– লোধা, খাড়িয়া, শবর, হো, বিরহড়, মুন্ডা, সাঁওতাল, মাহালি ও কোড়া। আমি প্রথমে লোধা সম্প্রদায়ের গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করছি। ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে বলেছেন–

> "লোধা শব্দটি সম্ভবতঃ সংস্কৃত 'লুব্ধক' শব্দ থেকে এসেছে। 'লুব্ধক' মানে ব্যাধ।"[৪]

এই উক্তির দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, লোধা সম্প্রদায় শিকার এর সাথে বিশেষ ভাবে যুক্ত। শিকারই তাদের পেশা। এই জাতির সংস্কৃতির আধারে নিজস্ব গ্রাম সংগঠন রয়েছে। যেটা পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বলেও জানা যায়। এই ব্যবস্থাতে পঞ্চায়েত প্রধানকে 'মুখিয়া' বলা হয়। তিনি গ্রামের সর্বোচ্চ সসম্মানীয় পদাধিকারি ব্যক্তি। ঐ গ্রামের সকল সদস্যের দায়িত্ব এই 'মুখিয়া' এর উপর বিন্যস্ত থাকে। পুরো গ্রামকে তিনি পরিচালনা করেন।

ঘরে ঘরে বিবাদ বা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলে, তার সমাধান কিন্তু এই 'মুখিয়া' করে থাকেন। এছাড়াও গ্রাম পরিচালনাতে আর এক ব্যক্তির অবদান রয়েছে, তিনি হলেন বার্তাবাহক। গ্রামে কোন সমস্যা দেখা দিলে তিনিই বার্তা আদান প্রদান করেন। এই বার্তাবাহক 'ডাকুওয়া' নামে পরিচিত। এছাড়াও গ্রামে পুজো অর্চনা করার জন্য একজন পুরোহিত থাকেন। পুরোহিতকে বলা হয় 'দেহরি বা দিহরি'। এই 'দেহরি বা দিহরি' লোধা সম্প্রদায়েরি একজন হয়ে থাকেন। এই গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থাপনা একটা ছকের সাহায্যে দেখালাম–

ছক নং– ১

পদের নাম	পদাধিকারি নাম
১। গ্রাম প্রধান	মুখিয়া
২। বার্তাবাহক	ডাকুওয়া
৩। পুরোহিত	দেহরি বা দিহরি

'হো' আদিবাসী জাতি বা সম্প্রদায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে বা প্রান্তে বসবাস করেন। গ্রাম্য পরিবেশ গঠন করে গ্রাম পরিচালনার চিত্র কিন্তু এই হো সমাজেও বর্তমান। হো জাতির ক্ষেত্রেও এই গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থাতে কয়েকজন সসম্মান পদাধিকারি ব্যক্তির অবদান রয়েছে। তাদের হাতেই কিন্তু গ্রাম পরিচালনার পুরো দায়িত্ত থাকে। হো সম্প্রদায়ের গ্রাম প্রধানকে 'মুন্ডা' বলা হয়। গ্রামের যে কোন জটিল সমস্যা তিনিই বিচার করে সমাধান করে থাকেন। এছাড়াও সংস্কৃতির বিভিন্ন কার্যকলাপ তিনিই পরিচালনা করেন। এছাড়াও গ্রাম প্রধানের একজন সহায়ক থাকেন। তাকে 'ডাকুওয়া' বলা হয়। গ্রাম পরিচালনার বিভিন্ন কাজে তিনি 'মুন্ডা'কে সহযোগিতা করে থাকেন। এছাড়াও আর একজন ব্যক্তির অবদান রয়েছে, তিনি হলেন 'দিওরি'। অর্থাৎ তিনি গ্রামের পুজো ব্যপারে সক্রিয় থাকেন। প্রত্যেক পদাধিকারি ব্যক্তি সংস্কৃতির দর্পণে বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। হো সম্প্রদায় এর গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা একটা ছকের সাহায্যে দেখালাম–

ছক নং– ২

পদের নাম	পদাধিকারি নাম
১। গ্রাম প্রধান	মুন্ডা
২। গ্রাম প্রধান সহায়ক	ডাকুওয়া
৩। পুরোহিত	দিওরি

'বিরহড়' আদিবাসী সম্প্রদায় মুলত পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলাতেই বসতি লক্ষ্য করা যায়। এই সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও কিন্তু গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা রয়েছে। এই গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা কিন্তু বিরহড় সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে গোষ্ঠীপ্রধান ব্যবস্থা নামে পরিচিত। গোষ্ঠীপ্রধান ব্যবস্থা নামের কারণ হল একাধিক গোত্রের মানুষ বসবাস করেন বলে। এই গোষ্ঠীপ্রধান ব্যবস্থাতে গোষ্ঠীপ্রধান এর সর্বোচ্চ সসম্মান পদাধিকারি ব্যক্তি হলেন 'নায়া'। এই 'নায়া' এর উপরেই কিন্তু গ্রাম দেখাশোনার সকল দায়িত্ত দেওয়া থাকে। সামাজিক যে কোনো সমস্যা তিনিই বিচার এর মাধ্যমে সমাধান করে থাকেন। গ্রামের ভালো ও খারাপ দিক গুলো পর্যালোচনা করেন। 'নায়া'কে বিশেষ ভাবে সাহায্য করার জন্য একজন ব্যক্তি থাকেন। তিনি হলেন 'কোতওয়ার বা দিগুওয়ার'। এই 'কোতওয়ার বা দিগুওয়ার' গ্রামের বার্তাবাহক রূপেও কাজ করে থাকেন। গ্রামের পুজোর ব্যাপারে বাড়তি দায়িত্ত 'নায়া' এর উপরেই বিন্যস্ত থাকে। বিরহড়দের গ্রাম সংগঠন বা গোষ্ঠীপ্রধান ব্যবস্থার একটা চিত্র ছক এর মাধ্যমে দেখানো হল–

ছক নং- ৩

পদের নাম	পদাধিকারি নাম
১। গোষ্ঠীপ্রধান	নায়া
২। বার্তাবাহক	কোতওয়ার বা দিগুওয়ার
৩। পুরোহিত	নায়া (বাড়তি দায়িত্ত)

‘মুন্ডা’ আদিবাসী সম্প্রদায় পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বসবাস করে আছেন। এই ‘মুন্ডা’ সম্প্রদায়-এর ক্ষেত্রেও নিজস্ব গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা রয়েছে। সংস্কৃতির আধারে তাদেরও গ্রাম পরিচালনার রীতিনীতি রয়েছে। সামাজিক কার্যকলাপ সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করার জন্য এই গ্রাম সংগঠনের গুরুত্ব অপরিসীম। মুন্ডা গ্রাম পরিচালনার মূল দায়িত্বে যিনি থাকেন, তাকে বলা হয় ‘মুন্ডা’। এই ‘মুন্ডা’ এর দ্বারাই গ্রামের সকল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যার সমাধান করে থাকেন। অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ সম্মান তিনি পেয়ে থাকেন। এছাড়াও একজন বার্তাবাহক থাকেন, যার নাম ‘মাহাতো’। গ্রামে দ্বন্দ্ব, ঝগড়া ও বিবাদের মতো কোন সমস্যা দেখা দিলে; তিনি এই বার্তা ঘরে ঘরে প্রেরণ করেন বিচারের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের বিষয়ে। এছাড়াও গ্রামের পুজো ব্যাপারে একজন পুরোহিত থাকেন, যার নাম ‘পাহান’। এই পাহান গ্রামের সমস্ত সামাজিক পুজো অর্চনার ভূমিকা পালন করে থাকেন। আবার মুন্ডা সমাজে অনেকগুলো গ্রাম নিয়ে একটা ‘পাড়হা’ গঠিত হয়। এই ‘পাড়হা’ এর একজন প্রধান থাকেন যার নাম ‘পাড়হা রাজা’। ‘পাড়হা রাজা’ এর একজন সহায়ক থাকেন, যিনি হলেন ‘দেওয়ান’। ‘পাড়হা রাজা ও দেওয়ান’ একি সঙ্গে সহযোগিতা দিয়ে গ্রামের সকল জটিল সমস্যা গুলো সমাধান করে থাকেন। মুন্ডা সম্প্রদায় এর গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা একটা ছকের সাহায্যে দেখালাম–

ছক নং- ৪

পদের নাম	পদাধিকারি নাম
১। মুন্ডা প্রধান	মুন্ডা
২। বার্তাবাহক	মাহাতো
৩। পুরোহিত	পাহান
৪। পাড়হা প্রধান	পাড়হা রাজা
৫। পাড়হা প্রধান	দেওয়ান

সাঁওতাল আদিবাসী সম্প্রদায় পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত আদবাসীদের তুলনায় বেশি ঘনবসতি লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক জেলাতেই সাঁওতাল সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রয়েছে। এদেরও সাংস্কৃতিক আধারে গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা রয়েছে। একটা গ্রামকে পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন পদ অনুযায়ী কার্যনির্বাহী ব্যক্তিবর্গরা রয়েছেন। এই গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা সাঁওতাল সম্প্রদায়ের কছে ‘মাঝি ব্যবস্থা’ বা ‘আতো মড়ে হড়’ (Majhi system) ব্যবস্থা নামে পরিচিত। তার উপরে যে ব্যবস্থা রয়েছে তা হল ‘মাঝি পারগানা ব্যবস্থা’। সংস্কৃতি অনুযায়ী প্রত্যেক গ্রামেই এই ব্যবস্থা রয়েছে। এই মাঝি ব্যবস্থাতে পাঁচ সদস্যের অবদান রয়েছে। যেটাকে তাদের ভাষায় ‘আতো মড়ে হড়’ নামে পরিচিত। এই ব্যবস্থাতে সর্বোচ্চ পদাধিকারী হলেন ‘মাঝি’। ‘মাঝি’ এর হাতেই গ্রাম চালনার সকল দায়িত্ব বহাল থাকে। গ্রামে ঝগড়া, বিবাদ ও দ্বন্দ্বের মতো সমস্যা তৈরি হলে ‘মাঝি’ বিচার এর মাধ্যমে সমস্যা গুলোকে সমাধান করে থাকেন। সংস্কৃতির বিভিন্ন কার্যে ‘মাঝি’ এর অবদান

অপরিসীম। 'মাঝি' এর পরবর্তী সদস্য হলেন 'পারানিক'। পারানিক এর কার্য হল 'মাঝি' এর অনুপস্থিতিতে তার কার্য সম্পাদন করা। এক কথায় 'মাঝি' এর সহযোগী হলেন 'পারানিক'। পারানিক এর পরবর্তী সদস্য হলেন 'জগ-মাঝি'। এই জগ-মাঝি এর কার্য হল গ্রামের সকল যুবক ও যুবতিদের পাহারাদার। সংস্কৃতির নিয়মানুসারে যুবক, যুবতিদের জ্ঞান সচেতন মুলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করানো ও সামাজিক মূলক শিক্ষা-দীক্ষা প্রদান করা। জগ-মাঝি এর পরবর্তী সদস্য হলেন 'গডেত'। 'গডেত' এর কার্য হল বার্তা আদান প্রদান করা। প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে বিশেষ সামাজিক কার্য এর বার্তা দিয়ে থাকেন। 'গডেত' এর পরবর্তী সদস্য হলেন 'নায়কে'। যিনি সামাজিক পুজা অর্চনার কার্য করে থাকেন। এই পাঁচ বর্গের সদস্য গ্রামকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করেন। এছাড়াও সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিতে তিন বা ততোধিক গ্রাম নিয়ে একটা 'পীড়' গঠিত হয়। আবার অনেক গুলো 'পীড়'কে নিয়ে একটা 'তল্লাট' গঠিত হয়। তল্লাট এর উপরে 'মুলুক' গঠিত হয়। প্রত্যেক ভাগের একজন করে মূল দায়িত্বে থাকেন। তাদেরকে 'পারগানা' বলা হয়। পারগানা এর কার্য হল বিভিন্ন বিচার আচার সুষ্ঠ ভাবে সম্পাদন করা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ঐতিহ্য রক্ষা করা। সাঁওতাল সম্প্রদায় এর গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা একটা ছকের সাহায্যে দেখালাম–

ছক নং– ৫

পদের নাম	পদাধিকারি নাম
১। গ্রাম প্রধান	মাঝি
২। গ্রাম প্রধান সহায়ক	পারানিক
৩। যুবদের পাহারাদার	জগ-মাঝি
৪। বার্তাবাহক	গডেত
৫। পুরোহিত	নায়কে

'মাহালি' আদিবাসী সম্প্রদায় পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলা গুলোতেই বসবাস করেন। মূলত মেদিনীপুর ও জলপাইগুড়ি জেলাতে এদের বসবাস এর সংখ্যা সবথেকে বেশি। মাহালি সম্প্রদায় বেশির ভাগই সাঁওতাল গ্রামের আশেপাশে ও তাদের গ্রামেই বাড়ি ঘর তৈরি করে বসবাস করেন। স্যার এইচ, এইচ রিজলে বলেছেন– "মাহালিরা সাঁওতালদেরই এক বিচ্ছিন্ন শাখা।"[৫] তাই তাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানান্তে সাঁওতাল সম্প্রাদায়ের ব্যবস্থাতেই সমাধান করে।

'কোড়া' আদিবাসী সম্প্রদায় পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই কম বেশি বসবাস করেন। তবে দার্জিলিং জেলাতে তাদের অস্তিত্ব বেশি পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। কোড়া সম্প্রাদায় অন্যান্য আদিবাসীদের মতোই তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি অনুযায়ী গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা রয়েছে। একটা গ্রাম পরিচালনায় নিজস্ব রীতিনীতি রয়েছে। গ্রাম পরিচালনায় গ্রাম প্রধানের দায়িত্বে যিনি থাকেন তাকে 'মাহাতো' বলা হয়। তাঁর হাতেই পুরো গ্রামের সকল ভালো-মন্দ বিন্যস্ত থাকে। এছাড়াও 'মাহাতো' সহকারী একজন থাকেন, যার নাম 'পারমানিক'। মাহাতোকে বিভিন্ন সামাজিক কার্যে সহায়তা করে থাকেন। এছাড়াও একজন বার্তাবাহক থাকেন। যিনি গ্রামের সামাজিক বিভিন্ন কার্যকলাপের বার্তা বাড়িতে বাড়িতে প্রেরণ করে থাকেন। তাকে 'গেড়াইত' বলা হয়। এছাড়াও গ্রামের সকল সামাজিক পুজা সম্পন্ন করার জন্য একজন পুরোহিত থাকেন, যার নাম 'পারমানিক'। এখানে পারমানিক দুইটা দায়িত্ব সামলান। এছাড়াও মাহাতো, পারমানিক, গেড়াইত এদের কার্যে বিশেষ ভাবে সহায়তা করার জন্য একজন থাকেন, যার নাম 'নেকি'। কোড়া সমাজে এই গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থার উপরে 'টোঠা পঞ্চায়েত' থাকে। গ্রাম পঞ্চায়েত এর কোন জটিল সামাজিক সমস্যা সমাধান

না হলে সেটিকে 'টোঠা পঞ্চায়েত'এ সমাধান করা হয়। এই টোঠা পঞ্চায়েত এ কিছু পদাধিকারি ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন। যিনি টোঠা পঞ্চায়েত এর প্রধান থাকেন, তিনি হলেন 'পাঁড়ে'। এছাড়া দেওয়ান এর কার্য যিনি করেন তাঁকে 'ছেড়িদার' বলা হয়। এছাড়াও একজন অঞ্চল তত্ত্বাবধায়ক থাকেন যার নাম 'এইন মড়ল'। এই ভাবে কোড়া সম্প্রদায় সমাজে গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা রয়েছে। তা একটা ছকের মাধ্যমে দেখান হল –

ছক নং –৬

পদের নাম	পদাধিকারি নাম
১। গ্রাম প্রধান	মাহাতো
২। গ্রাম প্রধান সহায়ক	পারমানিক
৩। বার্তাবাহক	গেড়াইত
৪। পুরোহিত	পারমানিক
৫। সকল সদস্যের সহায়ক	নেকি

'খাড়িয়া' আদিবাসী সম্প্রদায় পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও মেদিনীপুর জেলাতে বেশি পরিমানে বসবাস করেন। অন্যান্য জেলা গুলোতে সংখ্যার তুলনায় কম। এই খাড়িয়া সম্প্রদায়-ও বসবাস করার জন্য নিজস্ব গ্রাম স্থাপন করেন। সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আধারে এদেরও কিন্তু গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা রয়েছে। কিভাবে একটা গ্রামকে পরিচালনা করতে হয়, তা কিন্তু খাড়িয়া সম্প্রদায় এর পূর্বপুরুষেরা তৈরি করে দিয়ে গেছেন। খাড়িয়া সম্প্রদায় মুলত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত। ১) পাহাড়িয়া খাড়িয়া, ২) দুধ খাড়িয়া ও ৩) ঢেলকি খাড়িয়া। নিজস্ব গ্রাম পরিচালনা করার জন্য পঞ্চায়েত ব্যবস্থা রয়েছে। এই ব্যবস্থার প্রধানকে 'দিহুরি' বলা হয়। এই 'দিহুরি'র হাতেই কিন্তু পুরো গ্রামের দেখা শোনার ভার থাকে। এছাড়াও সামাজিক পুজো ক্রিয়া কলাপের জন্য এই 'দিহুরি'ই পুরোহিতের কার্য করে থাকেন। এছাড়াও পঞ্চায়েত ব্যবস্থাতে দুটো ভাগ রয়েছে। ১) পাহরা পঞ্চায়েত, ২) কুতমার পঞ্চায়েত।

'শবর' আদিবাসী সম্প্রদায় পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম দিনাজপুর ও পুরুলিয়া জেলাতেই তাদের বেশি পরিমাণে বসবাস লক্ষ্য করা যায়। অন্যান্য জেলা গুলোতেও কম বেশি ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করেন। তাদেরও সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আধারে নিজস্ব গ্রাম পরিচালনার জন্য গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা রয়েছে। গ্রাম পরিচালনার প্রধানকে বলা হয় 'প্রধান'। গ্রামের সকল সমস্যা ও শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব এই প্রধানের উপরেই বিন্যস্ত থাকে। এছাড়াও একজন বার্তাবাহক থাকেন যার নাম 'গড়েত'। এছাড়া গ্রাম পরিচালনায় আর কোন সদস্যের সন্ধান পাওয়া যায় না।

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান প্রাপ্ত হল। এবার এই গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা সেকাল ও একাল এর একটা চিত্র তুলে ধরছি। সেকাল বলতে আমি এখানে ভারত স্বাধীনতা লাভের পূর্বের কথা বলতে চাইছি। কারণ ভারত স্বাধীনতা লাভের প্রক্কালে দেশীয় শাসন ব্যবস্থা জারি ছিল না। বৃটিশ শাসনের অধীনে ছিল। সেই সময়ে দেশীয় প্রত্যেকটা আদিবাসী সম্প্রদায় নিজস্ব জাতিসত্তা সুস্থ ও সবল ভাবে বাঁচতে এই রকম সাংস্কৃতিক রীতিনীতি নিয়মাবলী তৈরি করেছিলেন। এটা একটা জাতির ঐতিহ্য মেরুদন্ড। একক জাতি হিসাবে বেঁচে থাকা নিজস্ব সংস্কৃতি চেতনার দ্বারা জাতিসত্তার পরিচয় বাঁচিয়ে রাখা ইত্যাদি। আদিবাসীদের মধ্যে এই রকম সংগঠন জ্ঞান চেতনা সত্যিই এক বিস্ময়কর আবিস্কার। এখানে আদিবাসী পূর্ব পুরুষদের জ্ঞানতত্ত্ব বাহবা পাওয়ার যোগ্য। কারণ বেঁচে থাকার এই মহান রীতিনীতিগুলো আদিম কাল হতে আজও একই নিয়মে আবহমান। একালের প্রসঙ্গে আমি লক্ষ্য

করেছি যে, ভারত স্বাধীনতা লাভের পর দেশীয় শাসন ব্যবস্থা শুরু হলে, আদিবাসীদের মধ্যে এই শাসন ব্যবস্থা একটা প্রভাব ফেলে। দেখা যায় এই শাসন ব্যবস্থায় ধীরে ধীরে তাদের সৃষ্ট রীতিনীতি থেকে অল্প অল্প করে ছিটকে যাচ্ছে। তাদের সংস্কৃতির সৃষ্ট নিয়মাবলীকে একটু একটু করে অবহেলা করতে করতে হারিয়ে ফেলতে শুরু করেছে। আগের মতো এই গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের মধ্যে আর কিন্তু লক্ষ্য করা যায় না। একমাত্র সাঁওতাল জাতি বা সম্প্রদায় সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত তাদের সংস্কৃতি চেতনাগুলো আজও ধরে রেখেছেন। দেশীয় শাসন ব্যবস্থা তাদের সংস্কৃতির উপর প্রভাব ফেলতে পারেনি। কারণ তারা যে আদিবাসী। তাদের শাসন ব্যবস্থা অনেককাল আগেই তৈরি হয়ে আছে। এবং সেটা আজও বর্তমান। তারা দেশীয় শাসন ব্যবস্থাকে যেমন সম্মান করেন, তেমনি তাদের সংস্কৃতিকেও মর্যাদাপূর্ণ সম্মান করেন। পশ্চিমবঙ্গের বাকি আদিবাসী সম্প্রদায় নিজেদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ভূলে গিয়ে হারিয়ে গেছেন কোন এক অজ্ঞাত পরিচয়ে। আদিবাসীদের মতো করে বাঁচতে হলে তাদেরকে ফিরে আসতে হবে নিজেদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পথে। আদিবাসীদের ঐক্য ধরে রাখতে এই গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে ব্যবস্থার মাধ্যমে ঐ জাতি বা সম্প্রদায় একটা সুস্থ জীবন যাপন করতে সক্ষম। এই বিষয়টা বুঝতে হবে। নিজেদের সৃষ্ট সাংস্কৃতিক চেতনা গুলোকে সম্মান দিতে হবে। গুছিয়ে থাকার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ করতে হবে। জাতিসত্তার পরিচয়কে অটুট রাখতে বিশেষ ঐক্যবদ্ধ ভাবে কার্য করে যেতে হবে। তবেই আদিবাসীদের গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা আগের মতোই জীবিত হয়ে থাকবে।

মূল্যায়ন:

আমার এই বিষয় 'পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা' সম্পর্কে বিশেষ আলোচনার দ্বারা সকল জ্ঞান উপস্থাপিত করলাম। বর্তমানে আদিবাসীদের গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা যে করুণ দৃষ্টান্ত লক্ষিত হচ্ছে, তা আগের মতো সচল রাখতে হলে তাদেরকেই বেশি করে ভাবতে হবে। যে সংস্কৃতির মহামূল্য সম্পদ এই গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থার দ্বারা প্রত্যেক আদিবাসী সম্প্রদায় এককালিন সুন্দর ভাবে বেচেঁ থাকতে শিখিয়েছে। সামাজিক বিভিন্ন সমস্যাগুলো গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা দ্বারা সমাধান করতে শিখিয়েছে। গ্রামের মর্যাদা রক্ষার্থে এই গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা যে কতটা প্রয়োজন তা কিন্তু আদিবাসী পুর্ব পুরুষেরা তৈরি করে দিয়ে গেছেন। এই গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রায় একই রকম। প্রত্যেক গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থাতে গ্রাম প্রধান আছেন। তাকে সহায়তা করার জন্য একজন সহায়ক থাকছেন। সমস্যার বিভিন্ন খবরগুলো পৌছে দেওয়ার জন্য একজন বার্তাবাহক আছেন। গ্রামের যুবদের দেখাশোনার জন্য একজন ব্যক্তি থাকছেন। এছাড়াও গ্রামের পুজো ব্যাপারে একজন পুরোহিত থাকছেন। এই সম্মানীয় সদস্যগুলো ঐ গ্রামের ঐ সম্প্রদায়ের-ই হতে পারবে। অন্য গ্রামের থেকে নয়। এ একটা বিশেষ নিয়ম রয়েছে। এই গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের কাছে সেকাল ও একালের কথা ভেবে জীবিত রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে তাদেরকেই।

তথ্যসূত্র:

১. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ। পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসি সমাজ (প্রথম খন্ড)। ষষ্ঠ প্রকাশ: অগাস্ট, ২০১৩, প্রকাশনায়: শ্রমতি রিংকি বাস্কে ১৮/১, শান্তিনগর রিজেন্ট পার্ক কলকাতা, ৭০০ ০৪০, পৃ. ০১।
২. তদেব, পৃ. ০১।

৩. তদেব, পৃ. ০১।
৪. তদেব, পৃ. ৩৯।
৫. তদেব, পৃ. ১৭০।

গ্রন্থপঞ্জি:

১। Risley, H, H. The tribes and castes of Bengal.
২। Dalton, E, T. Descriptive Ethnology of Bengal.